উত্তমকুমার সরণী : একক মানুষের এক নির্বিকল্প যাত্রাপথ নির্মাণ

সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়

তিনি কিংবদন্তী, তিনি সামান্য চরিত্রাভিনেতা থেকে নায়ক হয়ে মহানায়ক এবং আজও মহানায়ক, হয়তো ভবিষ্যতেরও। জীবনের প্রস্তুতিপর্বে তিনি কোনো সত্যজিতের অসামান্য প্রতিভার স্পর্শ পান নি। কিংবা ছকভাঙ্গা পরিচালক মৃণালের সাহচর্য পান নি।বরং মৃণালের 'ভুল করে করে ফেলা', 'রাতভোর', ভোরের আলোয় চোখ মেলেই রাতের অন্ধকারে চলে যায়। ঋত্বিকের কথা তোলাই যায় না-ছবির সংখ্যাই নগণ্য। বয়সের দিক থেকে প্রায় সমসাময়িক সবাই কিংবা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জন্মেছেন। পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষার বিপুল আভিজাত্য, প্রেসিডেন্সিয় বা বিশ্ববিদ্যালীয় গৌরবছটা কিংবা গণনাট্য আন্দোলনের রাজনৈতিক পশ্চাৎপট বা কলকাতার অভিজাত মঞ্চের আলোকবৃত্তে উপস্থিতি– অর্থাৎ এককথায় বাঙালির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীয় পরিমন্ডল বা বুধমন্ডলীর সদস্য না হয়েও একক প্রচেষ্টায়, অতুল প্রতিভার নিরন্তর অনুশীলনে ও সীমাহীন অধ্যাবসায়ে সখের থিয়েটারে অভিনয়ের পুঁজি নিয়ে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের দুশো পঁচাত্তর টাকার কেরাণী থেকে তিনি উত্তমকুমার হয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র অভিনেতা নয়– সংগ্রামী অভিনেতা। প্রমথেশ বড়ুয়া, দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় (মনে রাখতে হবে এরা দুজনেই ছিলেন অভিজাত বংশোদ্ভূত), শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়দের তৈরী করা পথে, কলকাতার মেট্রো সিনেমার চিফ অপারেটার পিতার দারিদ্র-লাঞ্ছিত সংসার থেকে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম যে কতটা কঠিন ছিল, সেই পতন অভ্যুদয়ের ইতিহাস আজকের বাঙালির খোঁজা উচিৎ--তাঁকে পুজো না করে। শুধু কি সফলতম অভিনেতা? পরিচালক, প্রযোজক, সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক এবং রুগ্ন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে শালপ্রাংশু মহাভুজ হয়ে একা টেনে নিয়ে যাওয়া--এই দশভুজ শক্তির পূর্ণতার নাম উত্তমকুমার। তিন দশকের শিল্পী জীবনে অভিনয় ছাড়াও বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতিটি সঙ্কটের আবর্তে কিংবা ছোট বড় যে কোন শিল্পী, কলাকুশলীদের সমস্যায় তিনি ছিলেন এক সংসপ্তক। বাংলা চলচ্চিত্রের পতনকে রক্ষা করতে নিজের বিপুল জনপ্রিয়তাকে অকাতরে দান করেছেন। নিজের স্টার ভ্যালুকে অগ্রাহ্য করে বহু চলচ্চিত্রে নিজের কষ্টার্জিত অভিনয় ক্ষমতার সঞ্চয় অপচয় করেছেন– শুধু এই আশায় ইন্ডাস্ট্রির ভাল হবে। শুধু ইন্ডাস্ট্রির নয়, এর কলাকুশলীদের উন্নতির জন্য এই মানুষটির মহামানবিক ভূমিকা যে মহানায়কের ভূমিকা থেকে কিছু কম নয়, আজ তা নতুন করে ফিরে দেখা দরকার। তাত্ত্বিক পরিচালকরা যে চলচ্চিত্র নিয়ে নানা সফল-অসফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পেরেছেন, সেখানে দর্শকের যোগানে এই বাণিজ্যিক ছবির ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে জন্যই উত্তমকুমার শুধু পর্দায় মহানায়ক নয়, বাংলা চলচ্চিত্রের মহাঅভিভাবকও।

বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য নিজের ইমেজ, মহানায়কত্বকে বাজি রাখার কারণ হল উত্তমের মধ্যবিত্তীয় জীবনের পশ্চাৎপট। অভিনয়ের সুতীব্র আকাঙ্খা বারবার ধাক্কা খেয়েছে দারিদ্রের জন্য। অতি কষ্টকরে দু'হাজার টাকা জামানত জমা রেখে পোর্ট ট্রাস্ট্রের ক্যাশিয়ারের চাকরিটা, অভিনয়ের প্রবল তাড়নায় বারবার দীর্ঘ অনুপস্থিতির দ্বারা কালিমা লিপ্ত হয়েছে। তবু পৌনঃপুনিক ব্যর্থতার পর সাফল্যের সন্দিগ্ধতায় সে চাকরি ছাড়তেও পারেন নি। দারিদ্র্যকে চোখের সামনে দেখেছিলেন বলেই তেতাল্লিশের

মন্বন্তরের সময় ভবানীপুরে বাড়ির পাড়ায় সপ্তাহে দু'দিন পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষের খাবারের আয়োজন করেন সতেরো বছরের উত্তম। সেই সময় বাংলা সমাজে বা অভিধানে 'সহনাগরিক' শব্দটি আজকের মতো চালু হয়নি। কিন্তু তখন নিরন্ন সহনাগরিকদের জন্য উত্তম এগিয়ে এসেছিলেন। মহারাষ্ট্রের মানুষ, ব্যবসায়ী চন্দ্রশেখর পারমার, রাঁধুনী বামুন চিন্তামনি ঠাকুর সবাই এগিয়ে আসেন এই বিপুল কর্মযজ্ঞে।

বাঙালি তার শিল্প-সাংস্কৃতিক জগতে কিছু কাল্পনিক দ্বৈরথ বানিয়ে রেখেছে। মূলতঃ শহুরে বাঙালি জনমানস এই কাল্পনিক দ্বৈরথে দুই পক্ষকে বসিয়ে নিজেরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে চর্চায় মেতে ছিল। যদিও আজ আর তাঁরা নেই কিংবা থাকলেও কণামাত্র বাঙালিত্ব নেই। এই দ্বৈরথগুলি হল— মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল, হেমন্ত-মান্না, সন্ধ্যা-আরতি, সত্যজিৎ-মৃণাল, সুচিত্রা-কণিকা, কিশোর- রফি, লতা-আশা। ঠিক তেমনি উত্তম-সৌমিত্র। দুইজনেই প্রতিভাবান, কোন প্রতি তুলনায় না গিয়েও বলা যায় সৌমিত্র ১৪টি ছবিতে পেয়েছিলেন সত্যজিৎকে। শুধু তাই নয় ১৯৫৯ সালে সত্যজিৎকে দিয়ে শুরু চলচ্চিত্র জীবন এবং ১৯৯০এ 'শাখাপ্রশাখা', অর্থাৎ দীর্ঘ ৩১ বছর সত্যজিতের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ। এমনকি ১৯৫৯এ 'অপুর সংসার'এর পরেই পেলেন তপন সিংহকে 'ক্ষুধিত পাষাণ'এ, ১৯৬০এ সত্যজিতের 'দেবী', ১৯৬১তে সত্যজিতের 'তিনকন্যা' ও মৃণালের 'পুনশ্চ'-এ। কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনা না করেও বলা যায় প্রস্তুতিপর্বে এই সুবিধা উত্তম পাননি, হয়ত পরিবেশ প্রতিবেশ সেই রকম ছিল না।

কিন্তু দেখা যাক উত্তমের উদ্যোগপর্ব। পঞ্চাশের দশকের একদম শেষ পর্বে যখন সৌমিত্র এসেছেন তখন বাংলা সিনেমা অনেক পরিণত। মুক্তি না পাওয়া হিন্দি ছবি 'মায়াডোর' বাদ দিলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত একক লড়াই করে নিজের জায়গা তৈরী করে, পঞ্চাশের দশকের শেষে বাংলা ছবিকে একটা শক্ত জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন উত্তমকুমার। বাংলা চলচ্চিত্র পেয়েছে স্বাধীনতা উত্তর বাংলার নায়ক-যার মধ্যে মহানায়কের বীজ উপ্ত। এরপর ১৯৫৫তে 'পথের পাঁচালী'তো আছেই। তৈরী মঞ্চ, তৈরী দর্শক প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পার করে বাংলা ছবি নতুন দিকে বাঁক নেবার উপযোগী হয়ে যাত্রা করতে ভরসা পেয়েছে। সৌমিত্র সেই বাঁধা ঘাটে এসে নোঙর ফেলেছেন। কিন্তু উত্তমকে বাংলা ছায়াছবি তরীকে শিল্প ও বাণিজ্যের তীরে নোঙর করার জন্য বাঁধাঘাটের প্রস্তুতিতে থাকতে হয়েছে। উত্তম সেই উদ্যোগপর্বের সেনা থেকে সেনাপতি হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে সেনাধ্যক্ষ হয়েছেন— কি পর্দায় কি পর্দার বাইরে। এখানেই উত্তম সর্বোত্তম 'ঝিন্দের বন্দি'র 'বাঙালির বাচ্ছা'— গৌরীশংকর রায়।

বি.কম. স্ট্যান্ডার্ড পাশ করে পোর্ট কমিশনের তরুণ ক্যাশিয়ারটির মনে অভিনয়ের রং ধরল কিভাবে এ বড়ো রহস্যের। তিনি নিজেও তা জানিয়েছেন। দশ বছর বয়সে স্কুলে, 'গয়াসুর' নাটকে অভিনয় করে মেডেল লাভ। 'লুনার' ক্লাব গঠন করে শখের থিয়েটারে অভিনয় 'মুকুট' নাটকে। ১৯৪২এ ম্যাট্রিক পাশ করে সঙ্গীতজ্ঞ নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গান শেখা। তখনকার সব নায়কই যে গায়ক! ১৯৪৪এ চাকরী। 'সুহৃদ সমাজ' যাত্রা ক্লাব তৈরী করে পরিবারের বাবা-কাকাদের সাথে সেখানে যাত্রা করতে লাগলেন। কলেজে যাতে ভর্তি হতে না হয় সেজন্য পালিয়ে গিয়ে অ্যামেচার থিয়েটারে যোগ দিলেন। ভবানীপুর থেকে হাতিবাগানের দর্পণা সিনেমার গলিতে গিয়ে অভিনয়ের টানে ছুটে গেছেন। নাটকে অভিনেতার অভিনয় দেখে নিজের মধ্যে সমালোচনাও করেছেন।

বাড়িতে গিয়ে নাটকের মহড়ায় যোগ দেওয়া। চাকরি অভিনয় দুই-ই চলল। পাড়ায় অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি। নাটক দেখতে দেখতে নাটকের চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ির অভিনয় দেখে উত্তমের মনে হল— ''সিরাজদ্দৌলা দেখে যখন বাসে করে বাড়ি ফিরছি তখন আমি সিরাজকে নিয়ে জটিল ভাবনায় জড়িয়ে পড়েছি।

আমার মনে তখন একটা প্রশ্ন যা দেখে এলাম সেখানে বাস্তবতার ছোঁয়া কতটুকু? আসল সিরাজ কি ঐভাবে হাঁটতেন? এইভাবে কথা বলতেন? ঐভাবে উত্তেজনা প্রকাশ করতেন? এইভাবে আমার আত্মপ্রস্তুতি চলতে লাগল.... আপন মনে থিয়েটারের সংলাপ বলতাম। গান গাইতাম। আর হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধতাম। এর মধ্যে কখন যে আবার রূপালী পর্দায় অভিনয় করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম তা ঠিক জানি না। সিনেমায় আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খা তখন প্রবল আমার। সিনেমা দেখতাম বলেই সিনেমার প্রভাব আমার উপর বিস্তার লাভকরেছিল।”

এই করতে করতে ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও-র মায়াজালে পাঁচ সিকে পারিশ্রমিকের চাকরি। আসল চাকরি যায় যায়। মুক্তি না পাওয়া হিন্দি ছবি ‘মায়াডোর’-এ অভিনয়ের সুযোগ, সেই স্বাধীনতার বছরে। তবে পরের বছর ১৯৪৮এ বাংলা ছবিতে অরুণোদয় হয় অরুণের। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে ছবি ‘দৃষ্টিদান’, পরিচালক নীতিন বসু। এক্সট্রা হয়ে পেলেন সাতাশ টাকা, কমিশন বাদে হাতে এল সাড়ে তেরো টাকা। ছবি কোন দাগ কাটল না। ১৯৪৯-এ নব্যেন্দুসুন্দর ব্যানার্জি পরিচালিত ‘কামনা’ ছবিতে অভিনয়, নায়িকা ছবি রায়। পারিশ্রমিক ১৫০০ টাকা পেলেও ছবি ফ্লপ। নাম পাল্টে ১৯৫০এ ‘মর্যাদা’ ছবিতে নামেন অরূপকুমার। নায়কের রোল, কিন্তু ব্যর্থ। ১৯৫০ সাল তো উত্তমের অভিশপ্ত। তিনটে ছবি, তিনটেই ফ্লপ। রাজেন চৌধুরীর ‘ওরে যাত্রী’, (নায়ক দীপক মুখার্জি, উত্তম সেকেন্ড হিরো, পেয়েছিলেন সাতশ টাকা) অগ্রদূতের ‘সহযাত্রী’, যার বিপরীতে ভারতীদেবী এবং পশুপতি চ্যাটার্জী পরিচালিত ‘নষ্টনীড়’– বিপরীতে সুনন্দা দেবী। ১৯৫২-র প্রথমদিকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি সুকুমার দাশগুপ্তের ছবি ‘সঞ্জীবনী’ (নায়িকা- সন্ধ্যারানী)। নামকরা অভিনেত্রী বিপরীতে থাকলেও অরুণ, অরূপ হয়ে গেলেন ‘ফ্লপ মাস্টার জেনারেল’। পেয়েছিলেন প্রচুর অবজ্ঞা। ‘ওরে যাত্রী’ সিনেমার শ্যুটিং- এ চূড়ান্ত অপমান। উত্তম করছেন ডাক্তারের পার্ট। গলায় স্টেথোস্কোপ। রোগিনী হচ্ছেন মঞ্চ ও পর্দার বিখ্যাত অভিনেত্রী প্রভা দেবী। প্রথম সিনে উত্তম নাড়ী পরীক্ষা করবেন। মুখে আলো ফেলা হল। মনিটর শুরু। উত্তমের রোগা চেহারা। ভেতরে ভেতরে খুব নার্ভাস। হাত উত্তেজনায় ঠান্ডা। আলো পড়তেই একজন বলে উঠল– ‘রাজেনদা এ কলির ভীমকে কোথায় পেলেন? পায়ে পাথর বেঁধে না রাখলে ঝড় দিলে উড়ে যাবে যে–!’ আর একজন বললেন, ‘একেবারে নতুন আমদানি হয়েছে গাঁ থেকে।’ মন্তব্য শুনে উত্তমের কাঁপুনি ধরে গেল। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। প্রভাদেবীর হাত ধরলেন নাড়ী দেখার জন্য। ঠান্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে প্রভাদেবী বলে উঠলেন, ‘এ ছেলে অভিনয় করবে কি। এর তো এখনই হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে জমে এসেছে। এ তো কাঁপছে ভয়ে’। সেটে কেউ কেউ বলতো ‘হিয়ার কামস নিউ দুর্গাদাস’, কেউ টিপ্পনী কাটলো ‘দুর্গাদাস’, না না তার চেয়ে বরং বল, ভবিষ্যতের ‘ছবি বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ওতো ওনারই পদ নেবে’। এই ছিল প্রথম দিকের উপহাস ভরা অভিজ্ঞতা।

যদিও এর মধ্যে ‘সহযাত্রী’ তে পান বিখ্যাত অভিনেত্রী ভারতীদেবীকে, কিছুটা হলেও পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন নায়ক হিসেবে রোমান্টিক হাসি ও কথার জন্য। কিন্তু তা সাময়িক। ‘সহযাত্রী’ সিনেমাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্তত তাঁর পোড়াকপাল ঘোরাবার জন্য তাঁর চেষ্টা কেমন ছিল বুঝতে। বাঁধা মাইনের চাকরিতে এম-পি প্রোডাকসনে উত্তম যোগ দিয়েছেন তিন বছরের জন্য। বেতন প্রথম বছর মাসিক ৪০০ টাকা, দ্বিতীয় বছর ৬০০ টাকা এবং তৃতীয় বছর ৭০০ টাকা। পোর্টের চাকরি বাঁচিয়ে স্টুডিওতে আসতেই হতো। উত্তম শুনলেন নতুন ছবি তৈরী হচ্ছে– নায়ক অসিতবরণ, নায়িকা ভারতীদেবী। এর আগে অমর দত্ত’র ‘ইন্দ্রজাল’ ছবিতে এই জুটি সুনাম পেয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ। ঠিক কয়েকদিন পর প্রোডাকশনের একজন খবর দিল ডেট পাবার সমস্যার জন্য অসিতবরণ ছবি করছেন না। সেই সুযোগ কাজে লাগালেন

উত্তম। অগ্রদূতের কাছে উত্তমের নাম প্রস্তাব করলেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ি। ফ্লপ হিরোর মধ্যে যে প্রতিভা আছে তা তিনি চিনতে ভুল করেন নি। আরো একজনও উত্তমের নাম প্রস্তাব করেন, তিনি পাহাড়ী সান্যাল, যাঁকে উত্তম বাবার মতো সম্মান করতেন। ছবি কিন্তু চলল না। বিমল রায়ের প্রথম ছবি 'উদয়ের পথে' সিনেমায় সুযোগের জন্য উত্তম যান, কিন্তু কোন লাভ হল না। টালিগঞ্জের ইন্দ্রপুরী, রাধা, নিউ থিয়েটার্স, ক্যালকাটা মুভিটোন, ভারতলক্ষ্মী-সর্বত্রই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকেন। একথা সত্যি চার বছরে সাত-সাতটি ছবি ফ্লপ করার পর আজকের দিনে সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা অভিনেতার পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো একপ্রকার অসম্ভব, তবু ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ল সেই ১৯৫২তেই। নির্মল দে'র ছবি 'বসু পরিবার' এনে দিল কিছুটা খ্যাতির পরিচিতি। নতুন ধরণের অভিনয়ের জন্য সকলের মুখে মুখে নাম এল। যদিও এই ছবিতে উত্তম নায়ক নন, দায়িত্ববান বড়দা।

একের পর এক ছবি ফ্লপ করলেও উত্তম যে হারিয়ে যান নি, তারজন্য তাঁর অধ্যাবসায় যেমন ছিল, তেমনি ছিল বাংলা ছবির পট পরিবর্তনের সম্ভাবনা। উত্তম সেই যুগ সন্ধিক্ষণের উদীয়মান অভিনেতা। উত্তমের ১৯৪৭ সালে সিনেমার জগতে আসার মাত্র ১৬ বছর আগে, ১৯৩১ সালের ১১ই এপ্রিল প্রথম বাংলা সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী' আসে। যদিও ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর মুক্তি পাওয়া দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস' যথার্থ সবাক ছবি। সেই হিসেবে এই ১৫-১৬ বছরে খুব বেশী ছবি হওয়া সম্ভব নয়, গুণমানেও নয়। বিষয়বস্তু হিসেবে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাহিনিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসত। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল- 'শেষ উত্তর' (প্রমথেশ বড়ুয়া'), 'গরমিল' (নীরেন লাহিড়ী'), 'বন্দী' (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়)। নানা পরীক্ষার মধ্যে বাংলা ছবি এগিয়ে চলেছে। ত্রিশের দশকের ছবির মধ্যেও থিয়েট্রিক্যাল অভিনয় প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল। ছবির বিষয়বস্তুও পৌরাণিক বা ধর্মীয় চরিত্রকে নিয়ে (চণ্ডীদাস, রাজরানী মীরা, বিদ্যাপতি) কিংবা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গল্পের সরাসরি চিত্রায়ণ (দেবদাস, গৃহদাহ, মুক্তি)। প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা, জটিলতা সম্পর্কের টানাপোড়েন সেভাবে চিত্রায়িত হয় নি। সিনেমার গঠনও ছিল খুবই দুর্বল এবং সংলাপ কৃত্রিমতায় ভরা।

চল্লিশের দশক থেকে আস্তে আস্তে থিয়েট্রিক্যাল ঢং থেকে সিনেম্যাটিক অভিনয় শুরু হল। 'উদয়ের পথে'-একটা বড় বাঁক বাংলা সিনেমায়। দেশভাগ-উত্তর বাংলা ছবি একটা সন্ধিক্ষণে আসে, কিন্তু তার মধ্যে স্টারডম থাকে না। উত্তম বাংলা ছবিতে স্টারডম এনে দিলেন। এরই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে কয়েকটি ইন্দ্রপতন। ১৯৫০ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে প্রমথেশ বড়ুয়া মারা গেছেন। ১৯৫০ সালে অহীন্দ্র চৌধুরী (ঘটনাচক্রে ভবানীপুরে দীর্ঘদিন থেকেছেন) ৫৫ বছর বয়সে ছবি করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ধীরাজ ভট্টাচার্য মারা গেছেন ১৯৫৯ সালে। আর ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তমের আগে যথার্থ স্টার, ম্যাটিনি আইডল। কেউ দুর্গাদাসকে বলতেন, 'ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ অব দ্য ইস্ট'। তাছাড়া, দুর্গাদাস ছিলেন মূলত থিয়েটারের যুগে, তিনি নিজেও মঞ্চাভিনয় পছন্দ করতেন।৪৯ বছর বয়সে ১৯৪৩এ মারা যান। প্রমথেশ বড়ুয়া চলচ্চিত্রের মানুষ হলেও তিনি প্রথমে একজন পরিচালক, তারপর অভিনেতা। নির্বাক, ও প্রারম্ভিক সবাক যুগের অভিনেতারা চলে যাওয়ায় বাংলা ছায়াছবিতে একটা শূন্যতা তৈরী হল। সেই শূন্যতায় সুদর্শন উত্তমের ছিল একটা বিরাট সুযোগ। তিনি মনে করতেন 'অভিনয় নয়, ভাবেই চরিত্র রূপায়ণ'- একথা স্বয়ং উত্তমকুমারের এবং তিনি তা মেনে চলতেন। প্রয়োগ করতেন তাঁর অভিনয় ক্ষেত্রে। ম্যাটিনি আইডল হবার সর্বগুণ যে তাঁর ছিল। খুব গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী করেন প্রখ্যাত নাট্যকার-নাট্য পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত। দেবনারায়ণ গুপ্ত 'ওরে যাত্রী' ছবির শুটিং-এ উত্তমকে দেখে বলেছিলেন- 'বেশ ভালো লাগল ভদ্রলোকের অভিনয়। দুর্গাদাসের পর মনে হল

দ্বিতীয় নায়ক'। দেবনারায়ণ গুপ্তের সেই অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী পরবর্তীকালে ভীষণভাবেই বাস্তবায়িত হয়। অভিনয় জীবনের প্রথম কয়েকবছর ও শেষ কয়েক বছর বাদ দিলে মাঝখানে যে ২০-২২ বছরের অভিনয় জীবন পড়ে থাকে সেখানে তিনি কিংবদন্তী। জীবদ্দশায় কিংবদন্তী হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম জনেরই হয়। পৃথিবীতে এমন অভিনেতা বিরল যিনি তিন দশক ধরে এক চলচ্চিত্র শিল্পকে একক প্রতিভায় টেনে নিয়ে গেছেন। উত্তম যথার্থ নায়ক ছিলেন বলেই সত্যজিৎ 'নায়ক' ছবি করতে পেরেছিলেন। তিনি স্বীকারও করেছেন- তাঁর কাজে ভুল ছিল, কিন্তু উত্তম নিখুঁত। আবার উত্তম কন্দর্পকান্তি নন। উত্তমের থেকে অনেক সুন্দর দেখতে প্রদীপকুমার, বিশ্বজিৎ, অনিল কিংবা বসন্তকুমার (আভিজাত্য ও গোল্ডেন ভয়েসও ছিল) সেখানে দাঁড়াতে পারলেন না। অসিতবরণের মতো অভিনেতা ম্লান হয়ে যায় উত্তমের স্টার ভ্যালুর কাছে। 'বসু পরিবার' এরপর 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতে উত্তমকুমারের চলাফেরা, পোশাক, চুলের সাজসজ্জা, ক্যামেরা ব্যবহার– সব পাল্টে যায়। হলিউডের স্টার ঘরানার কথা সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে তোলেন। ক্যামেরার দিকে পিছন করে, পাশে তাকিয়ে একটা বিশেষ স্টাইল নিয়ে আসেন। দর্শকদের তুমুল জনপ্রিয়তা পায় এই বিশেষ স্টাইল। উত্তম হলিউডের স্টার রোনাল্ড কোলম্যানের কথা উল্লেখ করেছেন। কোলম্যানের 'Double Life' দেখে উত্তম অভিভূত। বাংলা সিনেমায় হলিউডের স্টার ঘরানার বাঙালিয়ানা করেছিলেন , তাঁর অনুকরণীয় অভিনয় শৈলী দিয়ে। এই উত্তমকুমার ছবিতে অভিনয় না করেও ছবিতে ম্যাটিনি আইডল হিসেবে উপস্থাপিত হন তপন সিংহ পরিচালিত ক্ষুদ্রগল্প হলেও সত্যিক্ষ্ম সিনেমায় চিন্ময় রায়ের সংলাপের অংশ হয়ে। ''একবার বলো আমি উত্তমকুমার'' উত্তম বাঙালির পাশের বাড়ির ছেলে থেকে নায়ক হয়েছেন। আবার 'বাঘ বন্দী খেলা' সিনেমায় উত্তমই ছবির সব, তাকে ঘিরেই চিত্রনাট্য। তিনিই ছবিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। অগ্নীশ্বর সিনেমাও তাই।ঠিক যেমনটি সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'। তিনিই প্রথম তিনিই শেষ। এমন অনেক ছবি আছে তিনি বৃষস্কন্দ হয়ে টেনে নিয়ে গেছেন। উন্নাসিক বাঙালি কবি হাউসের আড্ডায় কি বলল তাতে উত্তমের কিছুই যায় আসে না, কারণ এই বাঙালিই এই নায়কের মুখ নির্গত সিগারেটের ধ্রুম্রবলয় নকল করতে বাধ্য হয়েছে।

আসলে উত্তমকুমার বোধহয় একটা কথা খুব মানতেন যেটা গোদার বলেছিলেন– ''You donót make a movie– the movie makes you''। এটাই হচ্ছে অভিনেতাদের কাছে বেদবাক্য। অভিনেতা কোন ছবি করেন না, প্রতিটি ছবিই একটু একটু করে অভিনেতাকে তৈরী করে। তাই বাংলা চলচ্চিত্রে একদিন যে অখ্যাত প্রতিভার ধীর অথচ স্পষ্ট, নিঃশব্দ অথচ প্রত্যয়ী, বিনীত অথচ আত্মবিশ্বাসী পদসঞ্চার হয়েছিল, তিনি জানতেন যে, কোন ছবির যে কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে পারলেই কিছু সঞ্চয় হবে। দীর্ঘ পথের পথিকের সে সঞ্চয় একদিন মহার্ঘ্য হবেই। তাই ফ্লপ, ব্যর্থ ছবিও তাঁকে তৈরী করেছে। তিনি উত্তমকুমার ছবি করেন নি। প্রতিটি ছবি তিল তিল করে তাঁকে উত্তমকুমার করেছে। উত্তমকুমার এমন এক ক্ষণজন্মা অভিনেতা, যিনি একই সঙ্গে যুগোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। তাঁর প্রভাব এমন নির্বিকল্প যে আজও তাঁর বিকল্প হলো না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য উত্তমের উত্তরসূরি হল না। প্রস্তুতিপর্ব থেকে কোনো বড় পরিচালকের সাহায্য ছাড়া, বাংলা সিনেমার পূর্বাপর বিপুল ঐতিহ্য ছাড়া তিনি এক রাজপথ নির্মাণে নেমেছিলেন। সে পথে আলোকবর্তিকা নিয়ে তিনি একাই পথ চলেছিলেন, একাই বিরাজমান।

তাই এ এক যাত্রা– একক মানুষের যাত্রা। সব সফলতম মানুষের যাত্রাই একক মানুষের যাত্রা। এটা প্রমাণ করে জন্মের শতবর্ষ পরে এবং মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতবৎসর পরেও তিনি উত্তম নন, সর্বোত্তম। বাঙালির প্রথম ও একমাত্র মহানায়ক। এবং সর্বশেষও।

— o —